তৃতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতার ভাবকল্পনা ও রূপরীতি : পরবর্তী বৈষ্ণবেতর কাব্যে তার প্রভাব সম্ভাবনা ।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে বৈষ্ণবপ্রেম কবিতা প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক প্রেম কবিতারই একটি বিশিষ্ট রূপ । রাধা-কৃষ্ণ ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নর-নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ । এই প্রেমগাথার প্রকাশ ভঙ্গি , প্রেমের গভীরতা, প্রথম প্রেমের চাঞ্চল্য, চাপল্য সবই পূর্ববর্তী প্রেম কবিতার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে রচিত । পরিবর্তন, পরিমার্জন অবশ্যই কিছু হয়েছে । বিশেষ করে, বৈষ্ণব-কবিতা ক্রমেই তত্ত্বের বাহন হওয়ায় নানা প্রকার দার্শনিক ~~উপলব্ধ~~ উপলব্ধি এর সাথে যুক্ত হয়েছে । এই তত্ত্বের পটভূমি ব্যাখ্যাত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে । কিন্তু তত্ত্বভিত্তিক হলেও প্রেমকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি । কবি কালিদাস রায় তার কারণ নির্দেশ করেছেন অতি সুন্দরভাবে —''পদাবলীর রচনার অঙ্গে সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও নাই । ইহা থাকিলে সাধক-কবিদের মতে রসাভাস ঘটিত । আধ্যাত্মিক সার্থকতা পদাবলীর অঙ্গীভূত নয় — ব্যঙ্গীভূত । ইহা লীলাতত্ত্ব হইতে আরোপিত অথবা লীলা-তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের মত হইতে সঞ্চারিত ।''

(পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ৩১)

এই তত্ত্বনিরপেক্ষ হার্দ্য আবেদনই বৈষ্ণব কবিতাকে পরবর্তী বৈষ্ণবেতর কবিতার রস-উৎস করে তুলেছে ।''বাঙ্গালী চিত্তের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে । জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমনভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যতপ্রেমের কথা তাহা ঐ রাধা-কৃষ্ণের বাঁধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাষায়ই প্রকাশকরিয়া গিয়াছে ।''

(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ''শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'',
তৃতীয় সং, পৃঃ ৩৫৬)

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বৈষ্ণবেতর বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব কবিতা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে । এখানে সংক্ষেপে কিছু পূর্ব- সূত্র আলোচনা করা যেতে পারে । ভাগবতের ভক্তিধর্ম বৈষ্ণব

সাধকদের মনে ও তৎকালীন জনজীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভক্তিকে বলা হতো দেবাদিবিষয়া রতি; একে 'ভাব' বলা হতো, রস' বলা হতো না।

শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু'তে ভক্তিকে 'রস' বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভক্তি রসের এই স্বীকৃতির ফলে ভক্তিরসের আলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। শ্রীরূপের ভক্তি রস ব্যাখ্যানের ফলে কবিদের কাব্যে ভক্তিরসের বিচিত্রপ্রকাশ আরও সহজ হয়ে উঠেছিল। ডঃ শুকদেব সিংহ মন্তব্য করেছেন — ''শ্রীরূপের এই ভক্তি রস স্থাপনের ফলে কবি প্রতিভা সম্পন্ন বৈষ্ণব সাধকেরা পদরচনাকেও সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা বিলাস বর্ণনা করিয়া পদকার গণ যখন পদরচনা করিয়াছেন, তখনও তাঁহাদের বিশ্বাস সাধনাই হইতেছে।''

(শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১১)

ভক্তিরসাপ্লুত পদের সাথে ব্যাপক পরিচয়ের ফলে বৈষ্ণবেতর কালের কবিদের পক্ষেও এই প্রভাব ও আলোড়ন এড়ানো সম্ভব ছিল না। বাউলরা তো বটেই, বিংশ শতকের কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি কবিও ভক্তি রসাশ্রিত কবিতা রচনা করেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গসেবা, যাকে 'মঞ্জরীভাব' বলা হয় তাও ভক্তিরসের ইতর বিশেষ। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ধরণের পদ প্রচুর। পরবর্তীকালে অনুরূপে কবিতা রচনা বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই বিশুদ্ধ ভক্তি রস ছাড়াও অনেক অবৈষ্ণব কবি গীত গোবিন্দের কবির আদর্শ অনুসরণ করে 'হরি স্মরণে'র সঙ্গে বিলাস-কলা'র বর্ণনা অত্যন্ত কুতূহলের সঙ্গে করেছেন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে এই প্রভাব কাজ করেছে। ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালাদের বৈষ্ণবীয়তার অনেকটাই এইভাবে এসেছে।

তত্ত্বতঃ যাই হোক না কেন, বৈষ্ণবপদাবলীর সাধারণ পাঠকের কাছে রাধা-কৃষ্ণ চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকার নির্বিশেষ বিগ্রহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধা-কৃষ্ণ মধুর লীলায় মত্ত। ঐশ্বর্য নয়, প্রেম এবং সর্বজগত্ পলাবী প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তু। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের গতি-প্রকৃতি, পরিবেশ, অভিসার, অভিমান সবই প্রাকৃত নর-নারীর প্রেমের আধারেই গঠিত। তাই অবৈষ্ণব কবিগান ও প্রেমের কাব্য রচনা করতে বসে কানুছাড়া গীত গাইতে পারেননি। প্রেমিকা নারীর অন্তর্জ্বালা ও প্রেমিক

পুরুষের রূপাসক্তি আজও ঠিক তেমনিই আছে । বৈষ্ণব পদাবলীর অমূল্যপদগুলো প্রেমের গভীরতায়, তীব্রতায় এত বেগবান যে প্রায় সব কবিই কখনো সচেতন, কখনো অচেতন ভাবে এর দ্বারস্থ হয়েছেন ।

আবার বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাকৃতিক পরিবেশ — ভাদ্রের ঝর ঝর বর্ষণে প্রিয়হীন গৃহকোণ, বর্ষায় ঐশ্বর্য কদম্বকেশর, উন্মুক্ত মাঠে রাখালিয়া বাঁশীর করুণ আহ্বান, মত্ত ডাহুকীর আর্তনাদ — এ সবই বাংলার তথা পূর্বভারতের কাব্যের বিষয়বস্তু । এই পরিচিত পরিবেশে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম এক ধর্মনির্বিশেষ আবেদন জাগায় পাঠকের মনে । পরবর্তীকালের অবৈষ্ণব কবিতায় তাই কবিগণ বৈষ্ণব কবিতায় সার্থকভাবে বর্ণিত এই প্রকৃতি-পরিবেশকে তুলে ধরবার মানসে বার-বার বৈষ্ণব পদাবলীর আশ্রয় নিয়েছেন ।

সেদিন পর্যন্ত নায়ক-নায়িকাকে রাধা-কৃষ্ণের সাথে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা এতই প্রকট ছিল যে এতে অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীও সামগ্রিক ভাবে কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কাব্য-কাহিনীর নায়ক নায়িকাকে রাধা-কৃষ্ণানুগ করে তুলতে পারলে কবি মনে করতেন তাঁর কাব্য খ্যাতিও অক্ষয় পুণ্য দু'ই লাভ হলো । নায়ক-নায়িকার মনোভাব বর্ণনায় আজও এই প্রভাব কাজ করে চলেছে । অন্তত: আধুনিক গানে তো বটেই । বস্তুত: রাধা-কৃষ্ণ ও প্রেম বাংগালী কবিদের কাছে সমার্থক বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হওয়ায় কবিরা এর আশাটুকু, ভাষাটুকু, দৃষ্টিটুকু যে যা পেরেছেন আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন ।

একদিন বৈষ্ণব কবিকুল সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে তিল তিল আহরণ করে যে তিলোত্তমা গড়েছিলেন বৈষ্ণব কবিদের পরবর্তীকালে সেই তিলোত্তমাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন অবৈষ্ণব কবিরা । শ্রীরাধা দেহ সৌন্দর্য, যা প্রাচীন ভারতীয় কবিতার উপাদানে গঠিত, সেই রূপ-শোভাকেই সামনে রেখে কবিকংকন মুকুন্দরাম গড়লেন অনন্দার দেহকান্তি । অধ্যায়ান্তরে এর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে । গোপীদের কুচ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কনক কটোরা', নিতম্ব বর্ণনায়, গুরুয়া নিতম্ব', দাঁতের প্রশংসায়, 'দশন মুকুতা-পাতি', সামগ্রিক দেহ সৌষ্ঠব বর্ণনায় 'স্থির সৌদামিনী', — ইত্যাদি প্রসঙ্গ অবৈষ্ণব কবিদের কাব্যে এসেছে মুখ্যত: পদাবলীর ভেতর দিয়েই । অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে পদাবলী এগুলো সযত্নে চয়ন করেছে ভাবীকালের কবিদের জন্য ।

প্রেমানুভূতির প্রকাশে বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক গীতি কবিতার আদর্শ হয়ে উঠেছিল অনেক ক্ষেত্রে। যদিও চৈতন্য পরবর্তী ভক্ত কবিদের কবিতায় ব্যক্তিক প্রেমানুভূতি-সুরভিত গীতিকবিতা সহজ লভ্য হবার কথা নয়, তবু বেশ কিছু বৈষ্ণব কবিতা ধর্মীয় গণ্ডি পার হয়ে গীতি কবিতা সুলভ ব্যক্তি হৃদয়ের আর্তিপ্রকাশ করেছে। পরবর্তী গীতিকবিদের কাছে এগুলো আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। ডঃ নীলরতন সেন তাঁর 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থে জ্ঞান দাসের ব্যক্তি হৃদয়ের রং-এ রাঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ পদের উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সুসঙ্গত বলে এখানে সেই পদটিও ডঃ সেনের বক্তব্য উদ্ধৃত হল।

''আলো মুই জানিনা জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিতমোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগরছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অনুরাগ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥'' ইত্যাদি

''এই পদের প্রথম ছয়টি পংক্তিতে যে প্রেমার্তি অভিব্যক্ত হয়েছে আধুনিক যে কোনও রোমান্টিক কবি এমনটি প্রকাশ করতে পারলে গৌরব বোধ করতেন। রূপের পাথারে আঁখি ডুবে যাওয়া এবং যৌবনের বনে মন হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রেমের অসীমতায় আত্মনিমজ্জনের এক অনির্বচনীয় উপমাধৃত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সাগরের সৌন্দর্যময় বিস্তৃতির সঙ্গে কৃষ্ণের শ্যাম দেহ সৌন্দর্যের তুলনা এবং গহন অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিম রহস্যময়তার সঙ্গে প্রেমিকের যৌবন স্বপ্ন ময়তার তুলনা,— এবং সর্বোপরি অসীম সাগরে থই না পেয়ে তাতে ডুবে যাওয়া এবং নিবিড় অরণ্যের মাঝে পথ হারানোর অনুভূতির সঙ্গে রাধার দৃষ্টি ও চেতনার সংযোগ সাধনের দ্বারা কবি যৌবনানুভূতির অতলান্ত নিবিড়তাকেই আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এই চিত্রাংকনে তিনি আর নিছক বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলার রূপকার নন, সর্বকালের যৌবনের দ্যুত তরুণ – তরুণীর জীবনে অনুভূত আনন্দ-রহস্যময় প্রেমানুভূতির সহৃদয় চিত্রকর।'' (পৃ. ১৫০ – ১৫১)

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলোতে অভিব্যক্ত প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের প্রকাশভঙ্গি পরবর্তী কবিদের অনুকরণের মূল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী বিভিন্নন স্থানে এটা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। জ্ঞানদাসের আরও

একটি পদ পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত করেছে। পদটি নৌকা বিলাসের।

মানস গঙ্গাজল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ ॥

কবির চিত্রাংকন চতুরতায় এছবি সর্বকালের প্রেমিক হৃদয়ের অনুভূতিতে সঞ্জীবিত। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই পদটির প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানদাসের আরও দু'টি পদের প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনার সাথে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ডঃ নীলরতন সেন।

''চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ ॥
পুছিতে কহএ আধ ভাখি।
নিঝরে ঝর এ দুন আঁখি ॥''

(মজুমদার : 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী', ১০১নং)

প্রায় একই প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও মেলে তুলনীয় কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় —

''মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু কথা আর নাহি
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।''

৪) জ্ঞানদাসের ''চঞ্চলমন মুকিত নয়ান / আবেশে অঙ্গ এলায়লি'' পদটি রবীন্দ্রনাথের ''খেয়া'' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়। জ্ঞানদাসের একাধিক পদেও আরও কিছু স্বনাম ধন্য বৈষ্ণব কবিদের পদে বিরহানুভূতির রোমান্টিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী ধৃত প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে অতলস্পর্শী বিরহ রবীন্দ্রনাথের মত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভাস্কর কবির মনেও দোলা দিয়েছে।

কবির কথায় — ''আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে।... আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ

লাভ করিবে। ... কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোন এককালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম; সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।... তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।'' — (প্রাচীন সাহিত্য : মেঘদূত) বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমবিরহের অমরগাথা এইভাবে অবৈষ্ণব কবিদের মনেও কাব্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক প্রেম সংগীতেও তাই প্রিয়জনকে পাওয়া ও না পাওয়ার আনন্দ ও বেদনা পদাবলীর সুরে সমন্বিত। হৃদয় কুটিরে যে রাধা কাঁদছে সেই রাধাইতো প্রেম যমুনার তীরে বাঁশী শুনতে পায়।

এখন পদাবলীর রূপরীতি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ, অলংকার, বিশেষত শব্দ ঝংকার বাংলা কাব্য-কবিতাকেও সামগ্রিকভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করে ব্রজবুলিতে আর চণ্ডীদাসের আদর্শে বিশুদ্ধ বাংলায় পদ রচনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। ব্রজবুলির প্রয়োগ একসময়ে লৌকিক প্রেমকাহিনীতেও সুলভ ছিল। বাংলায় যারা পদরচনা করেছেন তাঁরাও বিশুদ্ধ বাংলার সাথে ব্রজবুলির প্রয়োগ করেছেন প্রায়ই। ব্রজবুলি মিশ্রভাষা। কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। চতুর্দশ শতকের শেষে ও পঞ্চদশ শতকের শুরুতে মিথিলার বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন মিশ্র মৈথিলী ভাষায়। বাংগালী লেখকদের হাতে পড়ে এই মিশ্র ভাষা আরও অদ্ভুত চেহারা নিয়েছিল এবং ব্রজবুলি নামে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন —

" The attempts of the People of Bengal to Preserve the Maithili Language, without studying it Properly, Led to the development of a Curious Poetic jargon, a mixed Maithili and Bengali with a few Poems on Radha and Krishna. This mixed dilect came to be called 'ব্রজবুলি' (Brajabuli)"

(ODBL. Vol. I. P. 103)

ধ্বনিময়, শ্রুতি সুখকর ও প্রেম কবিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এই ব্রজবুলির আকর্ষণ অবৈষ্ণব কবিরাও ছাড়তে পারেন নি । মঙ্গলকাব্যে, মধ্যযুগীয় প্রেমকাব্যে, ভারতচন্দ্রে, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী তেও ব্রজবুলির স্পর্শ লেগেছে । শুধু কি তাই, কৌতুক কবিতা রচনা করতে বসেও আধুনিক কবি ব্রজবুলির দ্বারস্থ হয়েছেন অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াসে । +

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ব্রজবুলির প্রয়োগ বর্তমানে বিরল হলেও দীর্ঘদিন এই কৃত্রিম কাব্যিক ভাষাটি কবিদের হাতছানি দিয়েছিল । পদাবলীর ছন্দও অবৈষ্ণব কবিদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল । পদাবলীর ছন্দ-ঐশ্বর্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রপূর্বযুগে । কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত), মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) ও দলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত) ও লৌকিক দলবৃত্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায় । শেষোক্ত রীতির প্রচলন করেছিলেন চৈতন্য পরবর্তী কবি লোচনদাস ।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস – এই তিন কবির ছন্দরীতিই গৃহীত হয়েছে বেশী । বিশেষভাবে জয়দেবের ৪।৪।১২ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী (যেমন – রতি সুখ সারে । গতমভিসারে । মদন মনোহর বেশম ।)

চতুর্মাত্রাভাগের ষোলমাত্রার পদাকুলক ছন্দ, যেমন —

শুন বিনি । হিতনপি । হারমু । দারমু
সামনু । তে কৃশ । তনুবির । ভারম

জয়দেবের অনেক ছন্দকে গোবিন্দ দাস বাংলাভাষার উপযোগী করে নিয়েছেন বিদ্যাপতির আদর্শে । 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের আলোচনা

+ নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধরই
চাহিলুঁ টুটিতে মান ।
নাসাপর মুঝ ঘুঁষি চালাওল
দারুণ বজর সমান ।
মণ্ডল ঘুড়ি হাম পড়লু চরণ তলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার ।
তবহুঁ সে কোপ কঠিন হিয়া নাগরি
মোহে না করল পিয়ার ।
— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গে কবি দৌলত কাজীর উপর বিদ্যাপতি ও জয়দেবের ছন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি । অন্যত্রও, যেমন ভারতচন্দ্রে, ও জয়দেবের ছন্দপ্রভাব কাজ করতে আমরা দেখেছি ।

শুধুভাষা ও ছন্দই নয় পদাবলী তে সুনিপুণভাবে প্রযুক্ত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলংকারতো মধ্যযুগীয় কবিদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল । আধুনিক কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর চর্বণ পদাংশের ব্যবহার এক ধরণের কাব্যিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করে । বৈষ্ণব পদাবলী আধুনিক কবিদের কাছে অতীত দিনের দূরাগত সুখ স্মৃতির মত । আধুনিক কবিরা বৈষ্ণব পদাবলীর উল্লেখ বা উদ্ধৃতি দেন নোতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবার জন্যে, আবার কখনো বা নিষ্ঠুর বাস্তবের সাথে বিরোধাভাস সৃষ্টি করে পুরাতন মূল্যবোধকে নষ্ট করবার জন্যে ।

আধুনিক এ পৃথিবীর সংঘাতমুখর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হয় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেম প্রস্রবন বুঝি কত আগে শুকিয়ে গেছে । কিন্তু পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য রসধারা বাংলার বিচিত্র কাব্যভূমিতে পলি ফেলে তাকে যে ভাবে উর্বর করে তুলেছে, বর্তমান সুদীর্ঘ আলোচনায় তা লক্ষ্য করে আমরা আনন্দে অভিভূত হয়েছি ।